ছাই

বছর পাঁচেক আগের ঘটনা এটা। আমার স্বামী প্রণব তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটা এয়ার ফোর্স স্টেশনে চীফ ইঞ্জিনিয়ার। একদিন অফিস থেকে ফিরে সবে লাঞ্চ খেতে বসেছে এমন সময় দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক-কল এলো। দিল্লী এবং অন্যান্য জায়গা থেকে ট্রাঙ্ক-কল হমেশাই আসে, তবু ওকে খাওয়া ছেড়ে উঠতে হল বলে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিলাম। বিশেষ করে সেদিন এমনিতেই অফিস থেকে ফিরতে বেশ দেরী হয়েছে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে দেরী নেই আর। আমিও খাওয়া বন্ধ রেখে ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে আছি। পাশের ঘর থেকে ওর কথা কিছু কিছু কানে আসছে। কথাগুলো ঠিক অফিসের বাঁধা গৎ নয়। আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে কান খাড়া করে রইলাম। ও কাউকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছে। তবে মনে হচ্ছে ও তরফ একেবারেই অনড়-অটল। ক্রমশ প্রণবের গলায় হতাশা ফুটে উঠলো, "ঠিক আছে, তুমি বলছো যখন যত শীগ্‌গীর পারি পাঠিয়ে দেবো। আফ্‌টার অল্‌ এ বিষয়ে তোমার চেয়ে বেশী কে বুঝবে। তবু বন্ধু হিসেবে নিজের মতামতটা না জানিয়ে পারলাম না ----।"

রিসিভার রেখে খাবার টেবিলে ফিরে এলো প্রণব।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বললো, "শর্মা ফোন করেছিল দিল্লী থেকে। পাপ্পুর জণ্ডিস হয়েছে, বেশ বাড়াবাড়ি অবস্থা।"

পাপ্পু শর্মা-দম্পতির একমাত্র সন্তান। এখানে আসার আগে আমরা দিল্লীতে ছিলাম। পালমে আমাদের বাড়ি ওদের বাড়ির পাশেই ছিল। শর্মা প্রণবের কোর্সমেট। এ সব কারণে দু'টি পরিবারের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পাপ্পুর অসুখের কথা শুনে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো।

বললাম, "পাপ্পু কি হাসপাতালে?"

প্রণব বললো, "ডাক্তার ওকে হাসপাতালে মুভ করতে চায় কিন্তু শর্মা রাজী নয়। বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে।"

তারপর শ্রান্ত বিরক্ত গলায় বললো, "জানো শর্মা কেন টেলিফোন করেছিল? এখান থাকে মাইল তিরিশ দূরে একটা গ্রামে এক বাবাজী বিভূতি বিলি করে। সেই বিভূতি নাকি সর্ব রোগের মোক্ষম ওষুধ। তাই জোগাড় করে পাঠাতে বলেছে, তাই দিয়ে নাকি ওর ছেলের চিকিৎসা হবে ----।"

তারপর আমার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে ভারী গলায় বললো, "আর ওই বিভূতির নিয়ম হল তার সঙ্গে অন্য কোনও চিকিৎসা চলবে না। সব ওষুধ বন্ধ করে দিতে হবে ----।"

টেবিলের মাঝখানে রাখা ফুলদানীটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল প্রণব। একটা অব্যক্ত অনুভূতি চারিদিক থেকে যেন চেপে ধরলো আমায়।

প্রণব নিজের মনে বলে চললো, "জার্মানিতে থাকতে এরকম একটা কেস শুনেছিলাম। বাচ্চার টাইফয়েড হয়েছে, বাপ ডাক্তার না ডেকে ডাকলো ফেথ-হীলারকে। বাচ্চাটা বাঁচলো না। বাপ আর ফেথ-হীলার দু'জনেরই জেল হল শেষটা।"

প্রণব একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারী করতে লাগলো। আমি থালার অভুক্ত ঝোল-ভাত-তরকারী "টাইগার"-এর বাটিতে ঢেলে থালা দু'টো সিঙ্কে রেখে এলাম। টেবিল থেকে খাবারের পাত্রগুলো ফ্রিজে তুললাম। "টাইগার"-এর খাওয়া তদারক করতে করতে শুনলাম প্রণব ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে। আজ বিকেলেই নাকি "ফাগুয়া" অভিমুখে লোক যাবে বিভূতি আনতে ----।

পরদিন দুপুরে একজন লোক আমাদের বাড়ি এসে একটা পুরিয়া দিয়ে গেল প্রণবের হাতে। তারপর লম্বা সেলাম ঠুকে বিদায় নিলো। পুরিয়াটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো প্রণব।

জিজ্ঞেস করলাম, "এই সেই বিভূতি?"

ও একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো, "হুঁ।"

তারও পরের দিন বিকেলে শর্মার ট্রাঙ্ক কল এলো। প্রণব তখন বাড়ি নেই। শর্মার মরীয়া বিপন্ন কন্ঠস্বর ভেসে এলো "মিসেস চ্যাট্, আজকের প্লেনেও বিভূতিটা আসেনি। আগে জানলে দিল্লী থেকে আমিই কাউকে

পাঠাতাম। চ্যাট্ করছেটা কি? ও কি বুঝতে পারছে না এটা কি ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার?" ইত্যাদি ইত্যাদি ----।

প্রণব ফিরে এলে শর্মার ফোনের কথা বললাম। অবশ্য না বললেও চলতো কারণ তক্ষুণি আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতেই এক্সচেঞ্জ বললো দিল্লী থেকে কল এসেছে।

প্রণব আমার হাত থেকে রিসিভারটা নিতে নিতে চাপা গলায় বললো, "নির্ঘাত শর্মা। সকালে অফিসে তিনবার ফোন করেছিল। আমি রান্ওয়েতে ছিলাম বলে পায়নি।"

প্রণব রিসিভার কানে লাগাতেই লাইনের ওপার থেকে যা-সব বর্ষণ হতে লাগলো সেগুলো আমি স্বকর্ণে শুনতে না পেলেও ওর চোখ মুখের দ্রুত ভাব পরিবর্তন দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না। খানিক আগে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় 'শিভ্যাল্রি'র খাতিরে রাশ টেনে কথা বলছিল শর্মা, এখন আর সে প্রয়োজন নেই। মনে হল এইবার বুঝি বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবে। প্রণবের রগের শিরা বিপজ্জনকভাবে দপদপ করতে লাগলো। খানিক পর ও তরফ থেকে বাক্যবাণ বর্ষণে বিরতি হল বোধহয়।

প্রণবকে বলতে শুনলাম, "শোনো শর্মা, আমার তরফ থেকে কোনও গাফিলতি হয়নি। তুমি বৃথাই চটছো। আজ সকালের প্লেনে বিভূতি পাঠানো যায়নি কারণ সেটা তখনও এসে পৌঁছয়নি। জিনিসটা আজ বিকেলে এসেছে। কাল আমাদের একটা প্লেন নাসিক যাচ্ছে। সকালে টেক-অফ করে পালম পৌঁছবে দুপুর বারোটা নাগাদ। ওখানে দু'ঘন্টা হল্ট করে নাসিকের জন্যে টেক-অফ করবে। আমি বিভূতির প্যাকেটটা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মালহোত্রার কাছে দিয়ে দেবো, ওটা তোমায় পালম থেকে কালেক্ট করতে হবে ----।"

শর্মা আবার কিছু বললো।

প্রণব বললো, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দু'দিন লেগেছে ওটা জোগাড় করতে। আমি যে একজন সাংঘাতিক কেউকেটা সে তথ্য একমাত্র তুমিই জানো। "ফাগুয়া"র লোকেরা জানে না, তোমার সে বাবাজীও জানে না। আমার লোককে অতখানি পথ পাড়ি দিয়ে বহু কষ্টে সবাইকে ভজিয়ে ভাজিয়ে ওটি আনতে হয়েছে ----।

ফোন রেখে জানলার কাছে এগিয়ে গেল প্রণব। জানলার বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। আমি হতভম্ব হয়ে ওর পিঠের দিকে চেয়ে রইলাম। ও এইমাত্র শর্মাকে বললো যে বিভূতিটা আজ বিকেলে এসেছে। কিন্তু আমি তো জানি তা নয়। দু'দিন থেকে আমাদের বাড়িতে রয়েছে ওটা। তবে আজ সকালের ফ্লাইটে প্রণব পুরিয়াটা দিল্লী পাঠালো না কেন? আমার আট বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম ওকে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করতে শুনলাম।। কিন্তু কেন? হঠাৎ মনে পড়লো শর্মার প্রথম দিনের ফোনের পর প্রণব আমায় বলেছিল যে এই বিভূতির সঙ্গে অন্য কোনও ওষুধ ব্যবহার করা নিষেধ। পুরিয়া যতদিন না পাচ্ছে ততদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও শর্মা ডাক্তারী চিকিৎসা চালিয়ে যাবে কিন্তু ওটা পৌঁছনো মাত্র সবকিছু হয়তো বন্ধ করে দেবে "ফাগুয়া" গ্রামের বাবাজীর দেওয়া এক মুঠো ছাইয়ের ভরসায়। তাই কি প্রণব প্রাণে ধরে পুরিয়াটা তখনি পাঠাতে পারেনি?

দু'দিন পরের কথা। সকালে প্রণব বেরোনোর পর দরজা বন্ধ করে সবে রান্নাঘরে এসেছি, দরজার বেল বেজে উঠলো। ঝি এসেছে মনে করে দরজা খুলে দেখি সামনে খাকি ইউনিফর্ম পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে। অভিবাদন করলো।

বললাম, "সাহেব তো বাড়ি নেই, এইমাত্র অফিস গেল।"

লোকটা বললো, "জানি।"

আমায় অবাক হতে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, "আজ্ঞে আমি আহুজা। ক'দিন আগে আমি 'ফাগুয়া' গ্রাম থেকে এক পুরিয়া ভসম্ এনেছিলাম। সাহেব বলেছিলেন দিল্লীতে ওঁর বন্ধুর ছেলে অসুস্থ, ভসম্টা তারই জন্যে। ছেলেটি কেমন আছে এখন?"

বললাম, "পুরিয়াটা পাঠানোর পর আর কোনও খবর পাইনি।"

লোকটা একটু নিরাশ হল মনে হল। কয়েক মুহূর্ত মাটির দিকে চেয়ে রইলো। তারপর সেলাম করে চলে গেল। মনে মনে ভারি অবাক লাগছিল। জাতিভেদ উঠে গেলেও শ্রেণীভেদ এখনও আমাদের সমাজে বজায় আছে। বিশেষত এয়ারফোর্সে তো খুব বেশী রকম আছে। সাহেবের বন্ধুর ছেলের কুশলবার্তা জানার জন্যে সাহেবের বাড়ি অবধি ধাওয়া করা বেআইনী না হলেও রীতিমত বেমানান।

শর্মার ছেলের অসুখ নিয়ে চিন্তা থাকলেও গত ক'দিন প্রণবকে এ নিয়ে প্রশ্ন করিনি, কোথায় যেন বেধেছে। প্রণবও সযত্নে এড়িয়ে গেছে প্রসঙ্গটা। কাজেই পরদিন যখন ফোন বাজলো এবং রিসিভার তুলতে শুনলাম বিনীত কন্ঠে কেউ বলছে, "গুড মর্নিং ম্যাডাম, আমি আহুজা। সাহেবের দোস্তের ছেলে এখন কেমন আছে?" কোনও সদুত্তর দিতে পারলাম না আমি। প্রণবকে আহুজার বিষয় ওই একই কারণে কিছু বলিনি। আহুজার আগমন ও টেলিফোনের কথা বলতে গেলেই ওর প্রশ্নটার কথাও বলতে হবে এবং সে প্রশ্নটা আমারও।

আরও পাঁচ-ছ'দিন পর শর্মার ট্রাঙ্ক কল এলো।

এক্সচেঞ্জকে বললাম, "কর্তা এখন অফিসে, অফিসের নাম্বার ট্রাই কর।"

এক্সচেঞ্জ বললো, "ম্যাডাম, সাহেবের জন্যে নয়, আপনারই কল এটা।"

লাইনের অপর প্রান্ত থেকে শর্মার উদাত্ত কন্ঠ ভেসে এলো, "হ্যালো মিসেস চ্যাট্, কেমন আছ? হাউ ইজ লাইফ?"

তাড়াতাড়ি পাপ্পুর কথা জিজ্ঞেস করলাম।

বললো, "হি ইজ ফাইন। এখনও দুর্বলতা রয়েছে। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু একেবারে রোগমুক্ত এখন।"

বললো, "চ্যাট্ আমার উপর নিশ্চয়ই খুব চটে আছে। পাপ্পুর অসুখের জন্যে তখন মাথার ঠিক ছিল না আমার। ফোনে অনেক গালি-গালাজ করেছিলাম ওকে। কিন্তু তুমি তো জানো মিসেস চ্যাট্, চ্যাটের মত বন্ধু আমার দুনিয়ায় নেই। শুধু ওর জন্যেই ছেলেটা অত তাড়াতাড়ি সেরে উঠলো। আমাদের বরাত জোরেই তোমাদের ওখানে পোস্টিং হয়েছিল তা না হলে এ্যাদ্দূর থেকে কাকেই বা পাঠাতাম আর অজানা মুলুকে গিয়ে বিভূতির খোঁজে কত হয়রানি হত, কত দিন লেগে যেতো কে জানে। তোমাদের ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না। তুমি চ্যাট্কে বোলো আমায় মাফ করে দিতে। পাপ্পু একটু সবল হয়ে উঠলে আমি নিজে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসবো ----।"

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। মন থেকে বড় একটা পাষাণভার নেমে গেল যেন। নিজেদের উপর রাগ হল এতদিন অভিমান করে থাকার জন্যে। এর আগেই ট্রাঙ্ক-কল করে খবর নেওয়া উচিত ছিল আমাদের। ওদের একমাত্র সন্তানকে নিয়ে যখন যমে-মানুষে টানাটানি চলছে তখনও কিনা আমরা ওর কাছ থেকে চিরাচরিত ভদ্র, সৌজন্যমূলক ব্যবহারের সামান্য বিচ্যুতি ক্ষমা করতে পারিনি। নিজেদের মর্যাদার অহঙ্কার ও অভিমান নিয়ে দূরে সরে এসেছি। ধিক্ এই ঠুনকো বন্ধুত্বকে ----।

দরজার বেল বেজে উঠলো।

আহুজা সেলাম ঠুকে আমতা আমতা করে বললো, "মেমসাব, দিল্লী মে যো বাচ্চা বিমার থা বহ্ অব ক্যায়সা হ্যায় আপকো কুছ মালুম হ্যায়?"

বললাম সে ভাল হয়ে গেছে। এইমাত্র তার বাবা ফোন করে জানিয়েছে।

লোকটা হাত জোড় করে বিড় বিড় করে বললো, "ভগবান কা শুক্র্ হ্যায়। ছেলেটার কিছু হলে সারা জীবন সেই পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হত আমায়।"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "পাপ কেন? কিসের পাপ? এ সব কি বলছো তুমি?"

লোকটার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো।

ম্লান মুখে বললো, "মেমসাব, গত আট দশ দিন ধরে আমার রাতে ঘুম আসে না, ভাল করে খেতে পারি না। সব সময় মনে হয় আমার কাপুরুষতার জন্যে এক নির্দোষ বালকের প্রাণ যেতে বসেছে। মেমসাব, আমি সৈনিক। জীবনপণ করে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার পেশা। নিজের প্রাণের মায়া করি না। কিন্তু ইজ্জত আমার বড় প্রিয়। তারই মোহে সাহেবকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম সেদিন ----।"

লোকটার গলা বুঁজে এলো।

লোকটার কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কি বলতে চায় ও? প্রণবকে কি মিথ্যে কথা বলেছে? আর যদি বলে থাকে তো এখন আমার কাছে এসেছে কেন? অফিসের ব্যাপারের আমি কি জানি? সর্বোপরি,

শর্মার ছেলের কথাই বা রোজ রোজ জিজ্ঞেস করে কেন? লোকটা বোধহয় আমার ভ্যাবাচ্যাকা চেহারা দেখে বুঝলো যে ওর কথা আমার মগজে বিন্দুমাত্র ঢুকছে না।

কয়েক মুহূর্ত থেমে শুকনো ঠোঁট দুটো একবার চেটে নিয়ে মরীয়া হয়ে বললো, "মেমসাব সে দিন যে কাগজের পুরিয়া এনেছিলাম সেটা বাবাজীর দেওয়া ভসম্ নয়।"

"সেকি? সেটা কি জিনিস তবে?"

"সাধারণ ছাই। আমাদের গ্রামের বাড়ির উনুন থেকে নিয়ে কাগজে মুড়ে পুরিয়া বানিয়ে এনেছিলাম। সাহেবকে বললাম ওটাই ফাগুয়ার বাবাজীর দেওয়া ভসম্ ----।"

"কিন্তু কেন? কেন?" আহুজার কথা থেকে যা মর্মোদ্ধার করলাম তা এই : ----

শর্মার ফোন পেয়ে প্রণব আহুজাকে 'ফাগুয়া'য় পাঠানোর ব্যবস্থা করলো যেদিন সেটা শনিবার। প্রণব শুনেছিল আহুজার গ্রামও ওই অঞ্চলে, রাস্তাঘাট জানা আছে ওর। শনিবার বিকেলে রওনা হল আহুজা। বাবাজীর আখড়া খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়নি তাকে। বাবাজী এবং তার বিভূতির অলৌকিক কার্যকলাপের কাহিনী ডালপালা পল্লবিত হয়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়েছে। 'ফাগুয়া'র উপকন্ঠে পৌঁছতেই আখড়ার শোরগোল কানে এলো তার। গিয়ে দেখে বিরাট ব্যাপার সেখানে। প্রার্থীর ভিড়ে তিলার্ধ স্থান নেই। ঝুড়ি ভর্তি সাদা কাগজের প্যাকেট নিয়ে চেলারা বিলি করছে, খানিক পরে খালি ঝুড়ি তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ভরে নিয়ে আসছে আবার। আহুজা ভিড় ঠেলে তাঁবুর মধ্যে উঁকি মেরে দেখলো জন তিনেক লোক এক ডাং ছাইয়ের গাদার সামনে উবু হয়ে বসে দ্রুত পুরিয়া বানিয়ে চলেছে। ভক্তদের চাহিদার সামাল দিতে গলদঘর্ম অবস্থা তাদের। একটা পুরিয়া জোগাড় করে সেটা পকেটে পুরলো আহুজা। তারপর জীপে উঠে বসলো আবার।

মনে মনে একটা মতলব ঠাওরালো সে। ফিরতি পথে নিজের গ্রামটা ঘুরে গেলে মন্দ হয় না। মেন রোড থেকে পাঁচ কি ছয় কিলোমিটার দূর। হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। ফাগুয়াতে ঘন্টা দুয়েকেই কাজ হাসিল হয়েছে। সেই দু'ঘন্টাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছ'ঘন্টা দেখালে মোট চার ঘন্টা

সময় হাতে থাকছে তার। যা ভাবা তাই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে জীপ অন্য রাস্তা ধরলো। আহুজা মনের আনন্দে গান জুড়েছে তখন। চার ঘন্টা বললেও ঠিক চার ঘন্টায় অবশ্য কুলোলো না। বাড়িতে বাবা মা ভাই বোন ও নতুন বউ সমেত পাঁচজন। কথাবার্তা ও নাস্তাপানি করতে করতে রাত হয়ে গেল। ভাবলো রাতটা না হয় কাটিয়েই যাই এখানে। একেবারে ভোরবেলা উঠে ফিরতি পথ ধরবে। রাস্তাঘাট ফাঁকা সে সময়। জোরে জীপ চালিয়ে মেক-আপ করে নেবে কিছুটা।

ভোর রাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে চা দিলো ওর বউ। ঘুমচোখে জামাটা গায়ে চড়িয়ে নেহাৎ অভ্যাসবশেই পকেটে হাত দিয়েছিল আহুজা, আর দিয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল তার। পুরিয়াটা নেই। ঘুমটুম তক্ষুণি ছুটে গেল। আঁতিপাতি করে খুঁজলো। নাঃ কোথাও নেই। পকেটে নেই, ব্যাগে নেই, কোথাও নেই। নতুন বউ সারা বাড়ি খুঁজলো, জীপে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো আহুজা কিন্তু কোন হদিশই মিললো না তার। এদিকে হাতে সময়ও নেই আর। শেষে মরিয়া হয়ে বউকে বললো উনুন থেকে এক মুঠো ছাই এনে দিতে। একটু আগে উনুন পরিষ্কার করে স্বামীর জন্যে চা বানাবে বলে নতুন করে উনুন ধরিয়েছে বউ। ছাইটা উঠোনের এক পাশে রেখেছে, পরে তাই দিয়ে বাসন মাজবে বলে। সেখান থেকে খানিকটা মোলায়েম দেখে ছাই নিয়ে এলো। দেওর স্কুলে পড়ে। তার খাতা থেকে সাদা পাতা ছিঁড়ে আনলো সন্তর্পণে। তাই দিয়ে নতুন পুরিয়া তৈরী হল আবার। বউকে সাবধান করে দিল আহুজা, এ কথা যেন কাকপক্ষীটিও না টের পায়। পরদিন ক্যাম্পে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। সোজা সাহেবের কোয়ার্টারে গিয়ে ছাইয়ের মোড়কটা দিয়ে এলো।

এতক্ষণ পর্যন্ত এই একটি চিন্তাই ঘিরে ধরেছিল আহুজাকে, সাহেবের কাছে নিজের গাফিলতি কি করে চাপা দেবে। কর্মঠ, বিশ্বস্ত ও চালাক-চতুর বলে সুনাম আছে তার। এত বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা সুনামকে কিছুতেই ধূলিসাৎ হতে দিতে পারেনি আহুজা। অসাধুতার মূল্যেও রক্ষা করেছে তাকে। কিন্তু পুরিয়াটা সাহেবকে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার পর নতুন একটা চিন্তার পোকা ঢুকলো ওর মাথায়, ক্রমাগত কুরে কুরে খেতে লাগলো ওর সাদা-মাটা নিরঙ্কুশ জীবনটাকে। নিজের ক্ষণিক ভুলের ভয়াবহ পরিণতিগুলো প্রেতের মত তাণ্ডব জুড়ে দিল তার মনশ্চক্ষের সামনে। সাহেব ছাইয়ের পুরিয়াটা দিল্লী

পাঠিয়েছে, যেখানে রোগশয্যায় শুয়ে আছে এক মরণাপন্ন বালক। বাবাজীর বিভূতি সেবনের সত্যিই কোনও আশ্চর্য সুফল আছে কিনা জানে না আহুজা কিন্তু তাদের উনুনের ছাইয়ের তো কোনই অলৌকিক শক্তি নেই।

দিল্লীর ছেলেটির কি হবে তবে? যদি সে ভাল না হয় সে তো তারই গাফিলতিরর জন্যে। ব্যাপারটা ওখানেই থামবে না। আহুজার পাপের শাস্তি তোলা থাকবে তার জন্যে। সংসারে বুড়ো বাপ-মা রয়েছে, ভাইবোন আছে। আছে সদ্য বিয়ে করা বউ। এরপর ছেলেপুলে হবে তার। ওর প্রাপ্য শাস্তিটা কার উপর দিয়ে আসবে কে জানে। এই সব ভেবে ভেবে আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকে আহুজা। রুটি ভেঙে মুখে তুলতে পারে না, বিছানায় শুয়ে সারারাত ছটফট করে।

সঙ্গীরা ঠাট্টা মস্করা করে বলে, "আহা আনকোরা নতুন বউটাকে হাতের কাছে না পেয়ে দোস্ত দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে।"

ছুটি নেওয়ার নানান ফিকির বাৎলায়। আহুজা কিছু বলে না। মনে মনে ভগবানকে ডাকে।

"মেমসাব দিল্লীর খোকাবাবু সেরে উঠেছে শুনে কি আনন্দ যে হচ্ছে আমার ! ভগবান জানেন জীবনে জেনেশুনে কারও ক্ষতি করিনি। মেহনতের রোজগারে খাই। দেবতুল্য সাহেবকে সেদিন মিছে কথা বলেছিলাম শুধু তাঁর চোখে নিজের স্থান বজায় রাখতে। আমার ভীষণ অন্যায় হয়েছে মেমসাব। ওঁর বদলে তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও।"

বললাম, "সে অপরাধের শাস্তি যথেষ্ট পেয়েছো তুমি।"

আহুজা মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর একটু ইতস্তত করে বললো, "মেমসাব, সাহেবের জন্যে আমার মনে যতখানি শ্রদ্ধা, ভয়ও ঠিক ততখানি। এসব কথা যদি মেহেরবানি করে সাহেবকে না বলো ----।"

ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "তোমার কোন চিন্তা নেই। এসব কথা আমি কাউকে বলবো না।"

খুশি মনে চলে গেল আহুজা। আর আমি মানব চরিত্রের বৈচিত্রের কথা ভাবতে লাগলাম।